জোহানেসবার্গ সম্মেলন-২০০২

টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন ঃ আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা

মহাসচিবের বাণী

১। এই শীর্ষ সম্মেলন কি জন্য ?

মানব জাতির এক পঞ্চমাংশ এমন পর্যায়ের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে যা' তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের মানুষ স্বপ্নেও ভাবেনি। বাদবাকী মানুষ অসহনীয় বঞ্চনা ও বৈষম্যের মধ্যে দিনাতিপাত করে বলে ওই প্রাচুর্যের কিছু হিস্যা স্বাভাবিক ভাবে তারাও চায়। অথচ ইতোমধ্যে যারা উন্নয়নের সুফল পেয়েছে, তারাও উন্নয়নের বর্তমান মডেল অনুসরণ করতে থাকলে সেই অগ্রগতির ধারাকে টিকিয়ে রাখতে পারবেনা। ২০২৫ সাল নাগাদ এ বিশ্বে বসবাসকারী ৮০০ কোটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের তো' প্রশ্নই ওঠেনা।

২০০০ সালে সারা পৃথিবীর নেতৃবৃন্দ নিউইয়র্কে মিলিত হয়ে 'সহস্রাব্দীর ঘোষণা' (মিলেনিয়াম ডিক্লারেশন) অনুমোদন করেন। তাঁরা উন্নয়নের উচ্চাভিলাষী অথচ অর্জনযোগ্য এক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেন, বিশেষ করে পরবর্তী ১৫ বছরের মধ্যে তীব্র খাদ্যাভাব দূর করার ক্ষেত্রে। তবে এর পাশাপাশি তাঁরা "এ পৃথিবীকে মানুষ্য সৃষ্ট অপূরণযোগ্য ক্ষতি এবং তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নিঃশেষ করার বিপদ থেকে মুক্তির জন্যও" অভিমত ব্যক্ত করেন।

টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন (WSSD)-এর লক্ষ্য হলো মানবজাতির জন্য উপরোক্ত দু'টি লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। এ সম্মেলনের অভীষ্ট হলো মানবজাতিকে এমন এক অগ্রগতি অর্জনের পথ দেখানো যা কেবল তাদের জীবদ্দশাতেই নয়, বরং তাদের সন্তান এবং সন্তানের সন্তানদেরও কল্যাণে আসবে।

২। আমরা কী ধরণের ফলাফল আশা করতে পারি ?

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (সহস্রাব্দির উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা), এবং ১০ বছর আগে গৃহীত রিও ডি জেনেরিও ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত এজেন্ডা-২১ (প্রস্তাব-২১) প্রভৃতি দলিলে টেকসই উন্নয়নের বহু রূপরেখা ইতোমধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু তা' হলেও আমাদেরকে আরও সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করতে হবে কীভাবে আমরা টেকসই উন্নয়নের সেই সব অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে পারবো। সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সুদূর রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকতে হবে, যাতে করে আমাদের সঠিক পথে অর্জিত সাফল্য বা ব্যর্থতাকে আমরা সুচারুভাবে নিরুপন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করতে পারি।

এই অঙ্গীকারের কথা বলছি যে 'আমরা", তাদের মধ্যে অবশ্যই পরিবর্তন সাধনে সক্ষম এমন সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যে জিনিসটির আজ বড় বেশি প্রয়োজন তা' হলো বিশ্ব-পর্যায়ের একটি সমন্বিত উদ্যোগ। সরকারসমূহকে অবশ্যই একটি অভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনায় একমত হতে হবে এবং তা' অনুমোদন করতে হবে এবং এই পরিকল্পনা অন্যান্য একাধিক স্বেচ্ছাধীন অংশীদারের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। বিশ্বব্যাপী এই উদ্যোক্তাদের মধ্যে থাকবে সরকার, ব্যবসায়ী সমাজ, বেসরকারী সংগঠনসমূহ (এনজিও), স্থানীয় জনগণ, শিক্ষক সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

৩। যে পাঁচটি কর্মক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ফলাফল অতি আবশ্যক, অর্জনযোগ্য এবং যে গুলো সম্মিলিত ভাবে বাস্তবায়নযোগ্য বলে আমি মনে করি ঃ

পানি ও স্যানিটেশন ঃ ১২০ কোটি মানুষ সুপেয় পানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং এর দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষের নেই পর্যাপ্ত স্যানিটেশনের সুবিধা। অনিরাপদ পানিজনিত বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে ভূগে প্রতি বছর ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ২০২৫ সাল নাগাদ পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ চরম পানি ঘাটতির দেশসমূহে বসবাস করবে, যদি কিনা তখন থেকেই ত্বরিৎ এবং সুচিন্তিত বিহিত-ব্যবস্থা করা না হয়।

লক্ষ্যঃ "মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস্" (সহস্রাব্দির উন্নয়ন অভীষ্ট)- এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ২০১৫ সাল নাগাদ সুপেয় পানির সংকট কবলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেক কমানো এবং ২০২০ সাল নাগাদ দশ কোটি বস্তিবাসীর জন্য উন্নততর স্যানিটেশনের সুবিধা।

কর্মসূচী ঃ পানি ও স্যানিটেশন উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা প্রকল্পসমূহের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী উভয় সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করা ; পানি সরবরাহ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে, পানির অপচয় রোধ ("More Crop per drop") (প্রতি ফোঁটা পানিতে যত বেশি সম্ভব ফলন); এবং আঞ্চলিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত পানির সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা- বিশেষ করে একই প্রবাহের পানি যেক্ষেত্রে একাধিক দেশের মানুষ সুষমভাবে ভোগ করতে পারে, তা' নিশ্চিত করা।

জ্বালানীশক্তিঃ উন্নয়নের এক অপরিহার্য উপকরণ হলো জ্বালানীশক্তি। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দারিদ্র্যের ফাঁদ

থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সুলভে পর্যাপ্ত জ্বালানী সুবিধা পেতে হবে। উন্নয়নকে অর্জনযোগ্য এবং টেকসই করতে হলে গোটা বিশ্বকে দায়িত্বের সাথে জ্বালানী শক্তির ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

লক্ষ্যঃ প্রায় ১০০ কোটি বিশ্ববাসীর, যাদের বর্তমানে জ্বালানী শক্তির সুবিধা ভোগের সুযোগ নেই, তাদেরকে দূষনমুক্ত এবং সুলভ জ্বালানী সরবরাহের সুযোগ পেতে হবে ; নবায়নযোগ্য বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানী সম্পদের ব্যবহার এবং জ্বালানী ব্যবহারে দক্ষতা আরও বাড়াতে হবে।

কর্মসূচীঃ 'কিয়োটো প্রটোকল' অনুমোদন করতে হবে; জ্বালানী ক্ষেত্রে প্রদেয় ভর্তুকি এবং এই খাতে প্রযোজ্য কর রেয়াতের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে; দরিদ্র জনগনের জন্য দূষনমুক্ত জ্বালানী সুবিধা পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে- যার মধ্যে থাকবে গ্যাস সম্পদের বর্ধিত ব্যবহার (বিশেষ করে শহরাঞ্চলে), দক্ষতা-বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক এবং কারিগরী সহায়তা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পসহ উদ্ভাবনীমূলক অর্থনৈতিক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ, সরকারী পরিবহন খাতের উন্নয়ন (যাতে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ পরিবহন সুবিধা ভাগ করতে পারে), পুনর্ব্যবহার যোগ্য জ্বালানী শক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন এবং দক্ষ জ্বালানী প্রযুক্তি গবেষণা প্রভৃতি কার্যক্রমে আর্থিক অনুদান, প্রভৃতি সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সরকারী খাতের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন সরকারী খাতের উদ্যোগ বেসরকারী খাতকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং বাজারে উৎসাহ সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে।

কৃষি উৎপাদনশীলতাঃ ভূমির মান অবনতিতে বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি অনাবাদী হয়ে পড়ছে। ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অথচ অন্ন গ্রহণের মুখের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিশেষভাবে আফ্রিকা মহাদেশে লাখ লাখ মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।

লক্ষ্যঃ আফ্রিকায় কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা ; ভূমি অবক্ষয় রোধ করা এবং পুণরায় আবাদযোগ্য করে তোলা, যাতে মানুষকে বনভূমি, তৃণভূমি এবং জলাভূমি বিনাশ করে ভবিষ্যতের সর্বনাশ সাধন করে সাময়িক ক্ষুধা, খাদ্যাভাব মোকাবেলা করতে না হয়।

কর্মসূচীঃ টেকসই ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ করে আফ্রিকার দরিদ্র কৃষকদের জন্য খরা-সহনযোগ্য ফসল উন্নয়নের জন্য গবেষণা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান (যেমন- আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা বিষয়ক উপদেষ্টা গ্রুপের মাধ্যমে এধরনের সহায়তা দেওয়া যেতে পারে); ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ; মরুকরণ রোধে জাতিসংঘ কনভেনশন বাস্তবায়ন এবং তার সম্পদ বৃদ্ধিকরণ; এবং কৃষিতে পানিসম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি [এক্ষেত্রে আমি ঘানায় আমার নিজস্ব কৃষি খামারের উদাহরণ তুলে ধরতে পারি, যে খামারে আমি ২০07 সাল নাগাদ আমার বর্তমান দায়িত্ব শেষ হবার পর আবার ফিরে যাবো]।

জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনাঃ মানুষ বাঁচার জন্য জৈবিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ভাবেই পৃথিবীর বিচিত্র প্রজাতির প্রাণীকূলের উপর নির্ভর করে। অথচ বিশ্বের জীব বৈচিত্র্যের হার মারাত্মকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। পাখি ও স্তন্য পায়ী প্রজাতির প্রাণীকূলের বর্তমান বিলুপ্তির হার ১শত থেকে ১ হাজারের মধ্যে এবং যার জন্য মানুষের বিভিন্ন তৎপরতাই দায়ী। প্রায় ৭৫% সামুদ্রিক প্রাণী ধরা পড়েছে ; ৭০% কারাল নিবাস (রিফ) বিপন্ন ; প থিবীর উষ্ণমন্ডলীয় বনভূমি এবং ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ ইতিমধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

লক্ষ্যঃ যত বশী সম্ভব প্রজাতিকে সংরক্ষণ করা। এর অর্থ হলো মানুষের উচিত এমন ধরনের প্রজাতিনিবাস ও পরিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ করা যাতে বিভিন্ন প্রজাতি বেঁচে থাকতে পারে এবং টেকসই পরিবেশে প্রতিটি প্রজাতি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে পারে। মানবজাতির মধ্যে জীববৈচিত্র্যের সুফল প্রত্যেকে সুষম ভাবে ভোগ করা উচিত। উপকুলীয় দুষন এবং মৎস্য প্রজাতির মওজুদ অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। বনভূমি এবং উপকূলীয় সম্পদকে অবশ্যই টিকে থাকার মত করে সংরক্ষণ করতে হবে।

কর্মসূচীঃ অভয়ারন্যের বিস্তৃতি বাড়ানো; মংস্য, বন ও পানি সম্পদ বিষয়ক চুক্তিগুলি বাস্তবায়ন করা; মৎস আহরণে বিরতিকরণ; বেআইনী, অনিয়ন্ত্রিত এবং বিধিবহির্ভূত ভাবে মাছ ধরা ও মাছ মজুদকরণ বন্ধ করা; যারা এসব পেশায় নিয়োজিত রয়েছে তাদের টেকসই জীবিকার ব্যবস্থা করা; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ও ব্যবস্থাপনায় সম্মিলিত প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা; কম্যুনিটি-ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ-সেবার প্রকৃত মূল্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশঃ বর্তমান বিশ্বের ১১০ কোটি মানুষ অস্বাস্থ্যকর বাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে। বছরে ৩০ লাখ মানুষ বায়ু দূষনজনিত বিভিন্ন রোগব্যাধিতে ভূগে মারা যায়, যাদের মধ্যে ২০ লাখ মানুষই দরিদ্র, বিশেষ করে মহিলা ও শিশু, যাদের বেশির ভাগই মারা যায়, যারা কাঠ ও শুকনো গোবর পোড়ান জ্বালানীর দূষনজনিত ঘরোয়া ধুম্রবদ্ধতা ও প্রদাহে ভূগে মারা যায়। এছাড়া ত্রিরিশ লাখেরও বেশী মানুষ পানি দুষণজনিত বিভিন্ন রোগব্যধিতে ভুগে মারা যায়, এদের অধিকাংশই পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু।

লক্ষ্যঃ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা। ঘরের ভিতরে বা বাইরে সব ধরনের বায়ু-দূষণ সহ সকল প্রকারের পানি দুষণ ও রাসায়নিক বিষাক্রিয়াজনিত দুষণ অবশ্যই রোধ করা।

কর্মসূচীঃ উন্নত স্যানিটেশন এবং সুপেয় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা; রাসায়নিক দুষণ সম্পর্কিত দুইটি কনভেনশন অনুমোদন এবং বাস্ত বায়ন, একটি হলো পূর্ব অনুমোদন এবং অবগতি সাপেক্ষে অনুমোদন এবং অপরটি অব্যাহত জৈব দূষণ সম্পর্কিত; পেট্রোলিয়াম (গ্যাসোলিন) থেকে শীসা দুর করা এবং সর্ব প্রকার জ্বালানী তেল থেকে সালফার ও বেনজিন দুর করা; প্রচলিত জৈব জ্বালানীর স্থলে সুলভে দুষনমুক্ত জ্বালানী ব্যবহার; বর্জ্য উৎপাদন সংকোচন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন; গ্রীস্মমন্ডলীয় রোগব্যাধি নিরাময়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা (যেমন- ম্যালেরিয়া এবং আফ্রিকান গিনি ওয়ার্ম রোগ)। সাধারণতঃ এই রোগ দু'টি দূষিত পানি এবং স্যানিটেশনজনিত অব্যবস্থার কারণে ঘটে থাকে এবং এই বালাইয়ের অভিশাপ প্রধানত ঃ সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকেই বহন করতে হয়।

৪। প্রয়োজনীয় সম্পদ ঃ

একথা বলার মত নিতা করেলে

ভনিতা করে লাভ নেই যে এসব কর্মসূচী অর্থ ছাড়াই বাস্তবায়ন করা সম্ভব;

মেক্সিকোর মনিটেরীতে গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলনে (ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফিন-ান্সিং ফর ডেভেলপমেন্ট)-এ সার্বিক ভাবে উন্নয়নের জন্য পরিসম্পদ সংগ্রহের উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়। কিন্তু সুদুর প্রসারী অভীষ্টগুলো পূরণতো দূরের কথা সহস্রাব্দির উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্স্) পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অগ্রগতিও এখনো অর্জন করা সম্ভব হয়নি। যদিও উন্নত এবং

উন্নয়নশীল উভয় বিশ্বের দেশগুলিই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলো।

জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিতব্য শীর্ষ সম্মেলনের অন্যতম একটি দায়িত্ব হলো তার লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই খরচের হিসাব বাস্তবসঙ্গত ভাবে তুলে ধরা এবং কোথা থেকে অর্থ আসবে সেই সূত্রগুলো বিবেচনা করা। নতুন নতুন ব্যয়বহুল সংগঠন/সংস্থা গড়ে তোলাই বড় কথা নয়, অর্থ ব্যয় করে তাদের পালতে হবে। বরং সিদ্ধান্ত নিতে হবে কে কোন দায়িত্ব পালন করবে, সে সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা।

উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে কি কি করণীয় এবং সেগুলো কিভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে, তা' পরিস্কার ভাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে এই শীর্ষ সম্মেলন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করে তুলতে এবং বাড়তি পরিসম্পদ সংগ্রহে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।